কবি অরুণকুমার সরকার

আলোক সরকার

যা খুশি তাই যাক্ না লিখে
ঝগড়া করুক তিনশালিকে।

দায়দায়িত্বহীন কবিতা, তার একমাত্র লক্ষ্য কেবল একটা কবিতা হয়ে ওঠা, শিল্পকর্ম হয়ে ওঠা; সে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না, কোনো দায়িত্বপালনই তার অত্যাবশ্যক ব্রত নয়। তার ঘাড়ে কোনো ব্যাধিনিরসনের গরজ নেই, তাকে রাজবৈদ্য যেমন হতে হয় না, সেইরকম সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক হওয়ার কর্তব্যও তার নয়। 'প্রস্তাবনা' নামের সংলাপিকার অন্যতম চরিত্র সোমনাথের এই রকম ধারণা ছিল। ওপর-ওপর দেখলে অরুণকুমার সরকারের অনেক কবিতাই এই উক্তির প্রতিবাদ করবে, চল্লিশ দশকের সাধারণ কাব্যচরিত্রের মতো, অন্তত প্রথম অর্ধের প্রায় সব কবির মতো, তিনি সমাজ-সচেতন, সমাজের বিকৃতি স্খলন-পতন, দারিদ্র ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন তো ছিলেনই না বরং গভীর হতাশা বেদনায় ক্ষত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবু তাঁর কবিতা আবেগী গরিবানা অথবা পোশাকি চাঁদ-চকোরের বিরুদ্ধে ঘোষণা জানিয়েই থেমে থাকেনি, বিশ্বপ্রহরের অন্তর্লীন তাৎপর্য বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছিল—অর্থহীনতায় তাৎপর্যহীনতায় বিশ্বকর্মপ্রহরের অন্তর বিষাদ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, জীবনকে ঘিরে শূন্যময় নিষ্ফল যান্ত্রিকতা—যা তিরিশের কবিদের আক্রান্ত করলেও, চল্লিশে এসে আর তেমন উচ্চকিত হয়নি।

ছোট্ট নিস্তব্ধ এই ঘর
বর্ষার ক্লান্ত দ্বিপ্রহর
মলিন ধোঁয়াটে।
কাজ নেই আমি বেকার
তোমার করাতে কী ধার
দিনরাত কাটে।
হে সূত্রধর, বলি শোনো
তুমি কাটছ কিন্তু কোনো
কিছু গড়ছ না।
কিছুই হচ্ছি না আমরা
অবিরাম ঝরছে মরা
মুহূর্তের কণা।

অসংখ্য মুহূর্তের কণা
তুমি কিছুই গড়ছ না
ওহে সূত্রধর। (বেকার : দূরের আকাশ)

অহরহ অনিশ্চয়তায়, বাঁচা না-বাঁচার বন্দিদশার তীক্ষ্ণমুখ শিকে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাও তাঁর জন্য ছিল। সেই অদৃশ্য খাঁচা, সেই অচেনা ভীতির সর্বব্যাপ্ত আতঙ্ক এইসব অধিবিদ্যক গৃহহীনতা, অনাশ্রিতের অসহায়তা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এবং তথাকথিত সমাজচেতনা, যাকে নিয়ে তরুণ কবিরা আবেগী বস্তুবাদে মেতেছিলেন, তাকেও অরুণকুমার বুঝতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক পটভূমিতে :

গর্ভবতী ইতিহাস
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
তাই ভেবে ভয় পাই আজ।
তোমার সন্তান যত
মৃত বা জীবিত
সবাই বিকৃতরতি
বিকলাঙ্গ সব।
ব্যভিচারী অত্যাচারী লম্পট সন্ন্যাসী
তোমার প্রথম পুত্র ধূর্ত সে কপট;
তোমার দ্বিতীয় পুত্র স্বেচ্ছাচারী সামন্ত নৃপতি;
তোমার তৃতীয় পুত্র লোলজিহ্ব বণিক শ্বাপদ।
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
গর্ভবতী ইতিহাস? (রেস্তরাঁয় ২)

তবু অরুণকুমার তাঁর 'প্রস্তাবনা' নামের সংলাপিকাটিতে শেষপর্যন্ত কোন পক্ষ অনুমোদন করেছিলেন এ নিয়ে ভাবতে বসলে 'তন্ময়' নামের নিরীহ চরিত্রটিই আমাদের সামনে এগিয়ে আসে, বিশেষ করে তার অন্তিম উক্তিটি। সাহিত্যের সত্য বাস্তবের সত্য, নাকি কল্পনার, নাকি শিল্পের এ সব তত্ত্ব নিয়ে অরুণ সরকার প্রজ্ঞা আর হৃদয়তার দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন থাকলেও, মানুষের চেতনার, মানুষের কল্পনার, বস্তু অতিক্রান্তির ক্ষমতার চিরন্তন সত্যকেই তিনি সাহিত্যের একমাত্র সত্য জানতেন। তা তাঁকে এক প্রগাঢ় নিরাসক্তির তীর্থক্ষেত্র চিনিয়েছিল। সংলাপিতা 'প্রস্তাবনা'র অন্তিমে তন্ময়ের উক্তিই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে, শিল্পচর্চার প্রশ্নে তাঁর প্রকৃত ধ্যানক্ষেত্র :

আলস্যের চেয়ে কিছু ভাল নেই
আলস্যের পথ সীমাহীন,

আড় হয়ে শুয়ে আছি চিন্তার উপরে।
নরম ভাবনা যত এলোমেলো দক্ষিণের হাওয়া
সবচেয়ে অসম্ভব নভেলের নায়িকাকে
হাজির করেছে এই
দুই ক্রোশ, তিন ক্রোশ, চার ক্রোশ
দীর্ঘ অন্ধকারে। (প্রস্তাবনা)

অন্তত অংশত ছিল, তাঁর কবিতা আমাদের সামনে এইরকম প্রত্যয় আনে। তাঁর কাছে কবিতা রচনা একটা দায়দায়িত্বহীন কাজ, তাঁর কাছে কবিতার একমাত্র প্রতিশ্রুতি কবিতার কাছে, অনেক সময় একটা ক্রীড়াক্ষেত্রও বটে—দুলাইন কবিতা লিখে ঢাকার তরুণ অশোক মিত্রর কাছে পাঠালেন, পরের দুলাইন প্রস্তাব করে অশোক মিত্রর উত্তর এল। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হল কবিতা। কবিতা রচনার জন্য কোনো নিয়মিত ব্যায়াম তাঁর প্রয়োজন হত না। তিনি যে একজন কবি, কবিতা রচনা যে তাঁর অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, এ বিষয়েও তাঁর কোনো লাফালাফি ছিল না। কবিখ্যাতি, সাফল্য এসব বিষয়ে তাঁর তুচ্ছতাচ্ছিল্য বেশ প্রকট ছিল :

বিশ না পেলে বন্ধ পাশ
যে ক্লাশে সেই কেলাশ!

কবিতা রচনায় কোনো বাহাদুরি দেখানো না-দেখানো তাঁর কাছে সমার্থক ছিল।

চল্লিশের দশক, অরুণকুমার সরকার যে দশকের কবি, তা নিশ্চয় বিংশশতাব্দীর সবচেয়ে অস্থিত দশক। যুদ্ধ মন্বন্তর স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আকুলতা, নিত্যব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের চরম অনটন, পরবর্তী সময়ে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার সব মিলিয়ে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ও স্থিরকেন্দ্র ছিল না—পরিস্থিতির এই বিকীর্ণতা চিন্তাজগৎকে অসুস্থ আর বন্ধ্যা করেছিল নিশ্চয়। পুরোটা না হোক, অন্তত স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা যে তার স্ফূর্তি হারিয়েছিল সেটা বুঝে নিতে শ্রমের প্রয়োজন হয় না। চল্লিশে প্রকাশিত জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির'-এ অশোক মিত্র জীবনানন্দের কবিতার স্বভাবধর্ম 'বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ' স্তব্ধ প্রায় দেখেছিলেন। এই বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ সেদিন অনেকেই হারিয়েছিলেন, এমনকী অমিয় চক্রবর্তীর মতো নিমগ্ন চেতনার কবিও। সুধীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ঘনীভূত হয়েছে :

এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে।
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে।
মেদিনী মুখর এক নায়কের স্তবে।

১৩৫৩-র 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকীতে বুদ্ধদেব বসু জানান, 'দেশে আজ সাহিত্যিক দল বলে কিছু নেই, লেখার আবহাওয়া তাই চলে গেছে। তার বদলে আছে পোলিটিকাল পার্টি।

দল কথাটা শুনলে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি—কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতি চর্চার জন্য সাহিত্যিক সমিতি কিংবা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক—এইসব নিদারুণ অপভ্রংশের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়।... সাহিত্যের মূল্য যে মতে নয়, তথ্যে নয়, তত্ত্বে নয়, সাহিত্য আর সাংবাদিকতা যে স্বতন্ত্র, এই কথাটা দেশের লোককে ভুলিয়ে দেবার প্রতিদিন মুদ্রাযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষৌহিণী বাক্‌বাহিনী। এই বিকৃতি, এই আদর্শহীনতার ফলেই নবীনদের মধ্যে যেটুকু সাহিত্য শক্তি আজ আছে তা কিছুতেই বিকশিত হতে পারছে না।' সেই দুর্যোগে অরুণকুমার কবিতা লেখা থামিয়েছিলেন। বিপর্যয়ের সময়, যুদ্ধের সময় কবিতা রচনা নিষেধ করেছিলেন ইয়েটস্, আমাদের মনে আছে।

চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে এলোমেলো দু-একটা কবিতা লিখলেও, অরুণ সরকারের কবিতা লেখার শুরু বস্তুত স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময়ে। স্বাধীনতালাভের দিনগুলোর আগে-পরে রক্তপ্লাবিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ আর গৃহচ্যুতদের শোকধ্বনি যতই জড়ানো থাক তা বিভক্ত বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অন্তত একটা উজ্জ্বল উজ্জীবনের পটভূমিই তৈরি করেছিল। বাংলা কবিতায় একটা পালাবদলের ঘন্টা বেজে উঠেছিল—কবিতায় ফিরে আসছে স্নিগ্ধ গীতিকবিতার দিন—ব্যক্তি-আমি আর তার গহন মনের কান্নাহাসির দোলা। ১৯৪৭-এর কয়েক বছর পরে 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাণের লক্ষণ, স্বাস্থ্যের লক্ষণ তরুণতর কবিদের রচনায় মাঝেমাঝেই দেখা যাচ্ছে।' বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবতামসী আবার রাত্রি' সুনীলচন্দ্র সরকারের 'মিলিতা' এবং অরুণকুমার সরকারের 'দূরের আকাশ'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'কিন্তু সব সংশয় পেরিয়ে জীবনের ওপর বিশ্বাস যে এঁরা রাখতে পেরেছেন, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার স্বাস্থ্যে প্রত্যাবর্তনের পরিচয় পাওয়া গেল।...'দূরের আকাশ'-এর যেটি গভীরতম আপনতম সুর সেটি প্রকাশ পেয়েছে হার্দ্য কবিতায়।' সব মিলিয়ে এই গভীরতম আপনতম সুর, এই হার্দ্য বেদনাময় আর্তি, আত্মময় পর্যবেক্ষণ, একটা নির্ভেজাল 'আমি' অরুণ সরকারের কবিতার নিভৃতি, স্পর্শময় আর অনতিক্রমণীয়, তা চিরদিনের দুঃখ-সুখ, পাওয়া না-পাওয়া। অর্থাৎ শাশ্বত কবিতা।

ভালোবাসা তুমি সুদূর শঙ্খচিল
অনেক দূরের নীলে।
আজ মনে হয় হয়তো বা নয় ভুল
হয়তো বা ডেকেছিলে।

সেদিন হৃদয়ে অঝোর বৃষ্টিধারা
শুনতে পাইনি তাই দিইনিকো সাড়া
শুধু অনুমানে অভিমান দিশাহারা
দুয়ারে এঁটেছি খিল। (ক্রিসান্থিমাম : দূরের আকাশ)

যদি প্রশ্ন ওঠে অরুণ সরকারের কবিতার স্থিরবিন্দু কোথায়? উত্তর হবে প্রেম। আমার তাই মনে হয়। যে প্রেমে 'রূপ, কল্পনার তথা কবিতার আদি বাসস্থান', যে প্রেমের অধিষ্ঠান কবিতা কথা অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা সব কিছু একাকার করে, তা কেবল সুন্দর, তা সেই অন্ধকারের অশুচিতাকে অপছন্দ করে যা পুঁজ রক্তমাখা, ক্লেদ, তার আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নপ্রসবিনী অন্ধকার। সৃষ্টিশীল অন্ধকার। সব যন্ত্রণা, মধ্যবিত্ত জীবনের সব বঞ্চনার ঊর্ধ্বে যে প্রেম কবিতার আদি বাসস্থান, তাকে অনপনেয় সত্য জেনে তার ভিতরে অধিষ্ঠান। বলতে পারা যায় অকলুষ বিশুদ্ধ প্রেম। তিমির বিলাসের ঘৃণা বিদ্বেষের গরল সর্বাঙ্গে না মেখে হৃদয়ের সেই শ্বেত পাপড়ির অজস্রতাই প্রার্থনীয়।

শিকনিগয়ের ভর্তি নর্দমার পাশে
শুয়ে আছে অন্ধ বৃদ্ধ
পুঁজগন্ধ জীর্ণ জরদ্গব;
সারাক্ষণ সেবা করে সুন্দরী নাতনিটি।
নগরীর মলমূত্র নর্দমার জল
গঙ্গালজলে স্পৃষ্ট হলে আচমনীয় হয়
শুচিবাইগ্রস্ত বিধবারও।
পাড়ার ছোকরা যত বৃদ্ধটিকে কৃপা করে খুব
শিকনিগয়ের ভর্তি পিকদানিটাকেও
মনে হয় যথেষ্ট সম্ভ্রম করে।

কিন্তু তোমাকে মৃত্যু ঘৃণা করি আমি
অন্ধকার তোমাকেও পছন্দ করি না;
যদিও অনেক তাজা জীবনের আলো
স্বপ্ন, সাধ, বীজ, সম্ভাবনা
তোমাদের ঘিরে থাকে। (মৃত্যু)

কল্পনাশ্রয়ী নিভৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ থাকলেও ('আকাশকুসুম, তুমিই আমার সুখ') রচনার গঠনের প্রশ্নে অরুণকুমার ঐতিহ্যানুগ ধারাবাহিকতার দিকে পক্ষপাত রাখতেন। ছন্দনৈপুণ্য, শব্দ ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতা আর সংহত পরিমিতিবোধের অধিকারী তিনি কখনোই দ্ব্যর্থকতা বা অনিশ্চয়তাকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর কাব্যসম্ভার অসংখ্য স্মরণীয় উক্তি আর উপলব্ধির সংগ্রহশালা আর সব কবিতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ—সার্বভৌম, চিরন্তন। তার প্রাণময়তা, তাজা উষ্ণতা কোনোকালেই আড়াল করা যাবে না। এজ্‌রা পাউণ্ড এই জাতের কবিতাকেই ক্লাসিক বলতে চেয়েছিলেন (ABC of Reading)।

বস্তুত, গঠন, এমনকী ভাবনাচিন্তাতেও মৌলিকতা অর্জনের কোনো সাক্ষাৎপ্রয়াস তাঁর ছিল না, তাঁর কবিতার গঠন কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠত, যেমন তাঁর ভাবনাচিন্তা হৃদয় আর মননের যুগ্মতা। মৌলিক হওয়ার জন্য কায়দা কসরতের চমৎকারিত্ব তাঁর রচনায় নেই। তাঁর কবিতার মৌলিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা, তা কেবল মূল্য দিত অত্যাবশ্যক

শব্দ-ছন্দ, অত্যাবশ্যক উপস্থাপনের দিকে, আর তা এমন স্বতঃস্ফূর্ত সহজতায় ঘটত, পাঠক টেরই পেত না। মনে হয় এলিয়টের মতো তিনিও জানতেন Absolutely Original কবিতা, অর্থাৎ যে কবিতা বাস্তব জীবনে বিশ্বের সঙ্গে অসম্পর্কিত কিম্ভূত (bad) খারাপ কবিতা।

অরুণকুমার সরকার কবিতা লিখতেন এবং আর কিছুই লিখতেন না। একজন দায়িত্বসচেতন মননশীল মানুষের মতো তিনি সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাববাদী বা বস্তুবাদীদর্শন সবকিছুকেই ব্যক্তিগত বিশ্লেষণে বুঝেছিলেন কিন্তু কবিতা রচনায় কোনোকিছুকেই অনিবার্য মনে করতেন না, কোনো কিছুকেই পরিত্যাজ্য, না নতুন না পুরোনো, গঠনের দিক থেকে 'প্রস্তাবনা'র বরদাকান্ত যাকে শিল্পের জ্বালানি বলেছেন সেদিক থেকেও :

সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা;
সেই ঘাস, সেই আকাশ, মানুষ, নারী।
(একটি কবিতা : যাও, উত্তরের হাওয়া)

সাবেকি গঠন, সাবেকি আবহাওয়া, এমনকি অনেক সময় সাবেকি কাব্যসংস্কারের ভিতর অরুণকুমার সরকার অনেক সাবলীল, অনেক সহজ নিঃশ্বাস, এমন মনে হতেই পারে। কিন্তু তাই নিয়ে তিনি নিজে তো ননই, তাঁর পাঠকেরা যে কখনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এমন মনে হয় না। বরং তা অন্তত তাঁর কবিতাকে প্রাণময় করেছে, রক্তিমতা দিয়েছে।

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দুনয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

ও হাওয়া পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্তদুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে।

সোনালি ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা পরিমিত দিন।
এই আলো ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে, আনন্দ ঝরে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরস গন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয় স্বজন। (রিখিয়ায়)

মাটির দরে ভাড়া-করা অন্ধকার নিয়ে কবিতা রচনা করা অরুণ সরকারের প্রয়োজন ছিল না, তাঁর নিজের হৃদয়ে অনেক শ্বেত-পাপড়ি অন্ধকার ছিল, যা রূপরসগন্ধের আলোকে তাঁর স্নানের ব্যবস্থা রাখত।

কেবল ভাড়া-করা অন্ধকার নয়, কুড়িয়ে-পাওয়া কোনো কিছুই যুগের পণ্য, যুগের হুজুগ কিছুই তাঁকে মাতিয়ে তুলত না, নির্ভেজাল হৃদয়োচ্চারণকেই তিনি আবহমান কাব্যস্বভাব বলে মনে করতেন। অনুভূত আবেগই কবিতার প্রসঙ্গে একমাত্র আবেগ, আর সব ছাঁচের পুতুল। বইপড়া মানবিকতা, নকল শৌখিন মজদুরি, যা কোনো প্রতিক্রয়াই আনে না, চল্লিশের দশকের এই গতানুগতিকতা থেকে তিনি সরে আসতে চেয়েছিলেন, বরং তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় ছিল ন্যাপথলিনের ফিকে গন্ধ-মাখা স্মৃতিভারাতুর খেলার পুতুলগুলো। অবাধে ফলাফলহীন ছকে-বাঁধা কবিতা লেখার হই-হুল্লোড় থেকে কবিতাকে যাঁরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সুস্থ-সুনীল করেছিলেন, তাঁদের সামনে তিনি একটা খোলা আকাশের অবকাশ এনেছিলেন।

বিষয়ীদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন নিজেদের তৈরি করা বিষয়ের পাপচক্র থেকে।

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
যদি ফিরে আসে পুনরায়
বলব, 'আমাকে দাও দূরের আলোক,
দেবে না আমায়?

যেহেতু তোমার পাখা ভাবনার মতো
উড়ে যায় হাওয়ায় সহজে
আমার শরীর মন চেতনা সতত
তোমাকেই খোঁজে।' (দিঘা : যাও উত্তরের হাওয়া)

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছ, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখব বলে।
দ্যাখো, কত ভিড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না?
(মাথুর : যাও উত্তরের হাওয়া)

ঋণ : 'স্বকাল' পত্রিক